SEM VI (GEN)

DSE PAPER III

Some Aspects of European History (1789-1939)

Q. জাতিসংঘের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। কি কি কারণে উহা ব্যর্থ হয়েছিল ?

Ans. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর এরূপ যুদ্ধের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, মীমাংসার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির যাতে সমাধান সম্ভব হয় এবং শান্তি যাতে স্থায়ীভাবে বিরাজ করে তার জন্যই জাতিসংঘ বা লীগ-অফ-নেশনস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যৌথ নিরাপত্তা, বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন ধর্মী প্রচেষ্টা চালায়।

যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘের কার্যাবলী তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। ① প্রথম পর্যায়ে (১৯২০-২৪ খৃঃ) জাতিসংঘ তেমন সফল না হলেও তার ভাবমূর্তি বজায় ছিল। ② দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৯২৪-৩০ খৃঃ) জাতিসংঘের প্রচেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়। তাই এই সময় সাফল্যের যুগ বলা যায়। ③ তৃতীয় পর্যায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। এই সময় লীগের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে ও যুদ্ধের পরিবেশ তৈরী হয়।

তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে জাতিসংঘের কাউন্সিল পর পর দুটি কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশন দ্বারা সীমানা নির্ধারণ হলে ব্রিটেন, তুরস্ক ও ইরাক ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি দ্বারা ঐ সীমানা মেনে নেয়। ১৯২১ সালে যুগোশ্লাভিয়া আলবেনিয়া আক্রমণ করতে উদ্যত হলে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করে এবং আক্রমণের সম্ভাবনা দূর করতে সক্ষম হয়। ১৯২৩ সালে ইতালী গ্রীস আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করে ঐ রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করে। ১৯২৫ সালে গ্রীক সেনা বুলগেরিয়া আক্রমণ করলে কাউন্সিল গ্রীসকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ও গ্রীস ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

এছাড়া লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ড, জার্মানী ও পোল্যান্ড, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড, সার্বিয়া ও আলবেনিয়া ইত্যাদির মধ্যেকার বিভিন্ন দ্বন্দ্বমূলক সমস্যাও জাতিসংঘ মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান করতে সক্ষম হয়।

নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টাতেও জাতিসংঘ তার শক্তি নিয়োজিত করেছিল। ১৯২৫ সালে 'জেনেভা-প্রোটোকল' নামে এক চুক্তিপত্র প্রস্তুত করতে কাউন্সিল সক্ষম হয়েছিল। এতে বিভিন্ন দেশের সামরিক শক্তি হ্রাস করবার এবং সামরিক শক্তি দ্বারা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার নীতি ঘোষিত হয়। কিন্তু ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নগুলি এটি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করায় তা পরিত্যক্ত হয়। ১৯২২ সালে নৌ-শক্তি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে এক সম্মেলন আহূত হয়। ১৯২৫ সালে লীগের চেষ্টায় 'লোকার্নো চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এর দ্বারা রাষ্ট্রবর্গ তাদের বর্তমান সীমানা মেনে চলতে এবং মধ্যস্থতা মারফৎ বাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলতে স্বীকৃত হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে 'বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন' আহূত হয়। এই সম্মেলনে জার্মানী ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্র প্রস্তুত করার অধিকার দাবি করে। কিন্তু ফ্রান্স এতে আপত্তি করায় ঐকমত্য সৃষ্টি হয় না। ফলে জার্মানী সম্মেলন পরিত্যাগ করে। এরপর জার্মানী ভার্সাই-সন্ধির সমস্ত শর্ত উপেক্ষা করে অস্ত্র বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করে। অন্যান্য রাষ্ট্রও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ফলে লীগের নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য লীগ সফলতা লাভ করেছিল। (১) ম্যান্ডেট দেওয়া রাজ্যগুলি সম্পর্কে লীগ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতে কিছুটা সাফল্যলাভও করেছিল। (২) জলপথ, সারে অঞ্চল, দার্দানেলিস, বসফোরাস প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে লীগ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। (৩) এছাড়া, আফিম ও ক্রীতদাস ব্যবসায়, শ্রমিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে লীগ হস্তক্ষেপ করে ও সফলতা পায়।

(৪) আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও বিভিন্ন ক্ষতিপূরণের অধিকারী। ১৯২৭ সালের মধ্যে ২৭টি বিবাদ সম্বন্ধে এই বিচারালয় রায় দিতে সক্ষম হয়েছিল। একথা সত্য যে, জাতিসংঘ তার অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়েই সহযোগের চেষ্টা করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সাফল্যলাভ করে, কিন্তু সবক্ষেত্রে পারে নি। যেমন নিকারা-গুয়া সমস্যাকে মেক্সিকোর অভিযোগ, অসম চুক্তিগুলি সম্বন্ধে চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে বিবাদ, ইঙ্গ-মিশর দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে লীগ ন্যায় ও সততার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়।

জাতিসংঘ পৃথিবী থেকে যুদ্ধভীতি দূর করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই বিশ্ব আবার একটি (১) মহাযুদ্ধের মুখোমুখি হয়। ১৯২৪ সালে ইংল্যান্ড কর্তৃক 'জেনেভা-প্রোটোকল' প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় জাতিসংঘের প্রভাব দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। (২) শান্তি-পূর্ণভাবে সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে লীগের মাধ্যমে 'কেলগ-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৩১ সালে জাপান এই চুক্তি উপেক্ষা করে চীন আক্রমণ করে। কিন্তু লীগ তার বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে দুর্বল রাষ্ট্রগুলি লীগের ও আস্থা হারায়। (৩) নিরস্ত্রীকরণ সমস্যারও কোন সমাধান লীগ করতে পারে নি। ১৯৩২ সালের 'নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন' ব্যর্থ হয় এবং জার্মানী-ও ত্যাগ করে পুনরায় অস্ত্র নির্মাণে মন দেয়। (৪) পররাজ্য গ্রাস করার নীতিকেও লীগ রুখ করতে পারে নি। ১৯৩৫ সালে ইতালী আবিসিনিয়া দখল করতে শুরু করলে লীগ তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়। (৫) ১৯৩৮ সালে হিটলার অস্ট্রিয়া আক্রমণ করলেও লীগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি।

এইভাবে কয়েক বছর ধরেই লীগ ধীরে ধীরে ভাঙনের পথে অগ্রসর হয়। আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলি লীগকে উপেক্ষা করে আসছিল এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলি তার উপর

আবেদন হারিয়ে ফেলে। অবশেষে ১৯৩৯ সালে জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে জাতিসংঘের অস্তিত্ব কার্যত বিলুপ্ত হয়।

জাতিসংঘ যে তার মূল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল, তা কোন একটিমাত্র কারণের জন্য নয়। এর পিছনে কিছু গভীর কারণ বিদ্যমান। (১) লীগ অফ নেশনস্-এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। কোন অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এটি পরিচালিত হবার সুযোগ পায় নি। (২) বিভিন্ন রাষ্ট্রে তখনও উগ্র জাতীয়তাবোধ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। এই জাতীয় কোন সংঘের অস্তিত্ব ও কার্যকলাপ তাদের কাছে কিছুটা অলীক বলে প্রতিভাত হয়। (৩) জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা দ্বারা তখন রাষ্ট্রবর্গ অতিমাত্রায় প্রভাবিত ছিল। ফলে জাতিসংঘের প্রতি অখণ্ড আনুগত্য তাদের জন্মায় নি। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরে লীগের নীতি ও শর্তকে উপেক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করে নি। (৪) জাতিসংঘের যাত্রা শুরুতেই এর দুর্বলতা দেখা গেছিল। আমেরিকা প্রথম থেকেই লীগে যোগ দেওয়ায় ইচ্ছুক ছিল না। বলশেভিক রাশিয়াকে প্রথম দিকে লীগে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নি। বিজিত রাষ্ট্রগুলিকে, বিশেষ করে জার্মানীকে লীগের সদস্যভুক্ত করা হয় নি। এইসব কারণে লীগ খানিকটা দুর্বল অবস্থাতেই যাত্রা শুরু করে। (৫) এছাড়া যে সমস্ত রাষ্ট্র প্রথম থেকেই লীগের সদস্য ছিল, তাদের মধ্যেও ঐক্যের অভাব বরাবরই দেখা গেছে। বিশেষ করে, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত জাতিসংঘের পতনের পথ উন্মুক্ত করেছিল। (৬) জাতিসংঘের গঠনতন্ত্রের মধ্যেও এর ব্যর্থতার বীজ লুকিয়ে ছিল। কয়েকটি সাধারণ বিষয় ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধেই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্ববাদীসম্মত ভাবে গৃহীত হতে হবে — এটাই ছিল জাতিসংঘের নীতি। ফলে

কোন একটিমাত্র দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা থাকলেই কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। একারণে বহু সংকটজনক অবস্থাতেও লীগ একেবারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে নি। (৭) যে সমস্তক্ষেত্রে কাউন্সিল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত, সেইসব ক্ষেত্রেও তা কেবলমাত্র সুপারিশ হিসাবে গণ্য হত। সিদ্ধান্ত গুলি কার্যকর করার কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তার ছিল না। এইজন্যই আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলি অনেকবার লীগের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করতে সুযোগও সাহস পেয়েছে। (৮) তাই দেখা যায় যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হলে ঐ সরকারগুলি ক্রমেই আক্রমণশীল হয়ে উঠে এবং জাতিসংঘের ওপর চরম আঘাত হানে। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ইতালী কর্তৃক আবিসিনিয়া গ্রাস, জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল ইত্যাদি এই আগ্রাসী নীতিরই পরিচায়ক। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিগুলি বিশেষতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানী, জাপান ও ইতালীর আগ্রাসন রোধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি, বরং তোষণনীতি গ্রহণ করে একনায়কতন্ত্রী শক্তিগুলির পররাজ্য গ্রাসে সহায়তা করেছিল। (৯) পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৩০ সালের পর বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি যে জটিল সমস্যায় পড়ে, তা জাতিসংঘের কাজ পরিচালনার পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না। ১৯২৯-৩০ সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা দেখা দেয় এবং এর ফলে সমগ্র বিশ্বের দেশসমূহে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য জাতিসংঘ বিফলতায় পর্যবসিত হয় সত্য, কিন্তু তার অবদান যে একেবারেই ছিল না তা নয়। জাতিসংঘ পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব প্রদর্শন করেছিল, বিশ্বে শান্তির আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে উচ্চে তুলে ধরেছিল — যা কোনদিন বিলুপ্ত হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবার একটি আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এর পিছনে 'লীগ-অফ-নেশনস্'-এর অতীত ইতিহাসই প্রেরণা যুগিয়েছিল। এখানেই তার সার্থকতা।

— ০ —